সহজ পাঠ: প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

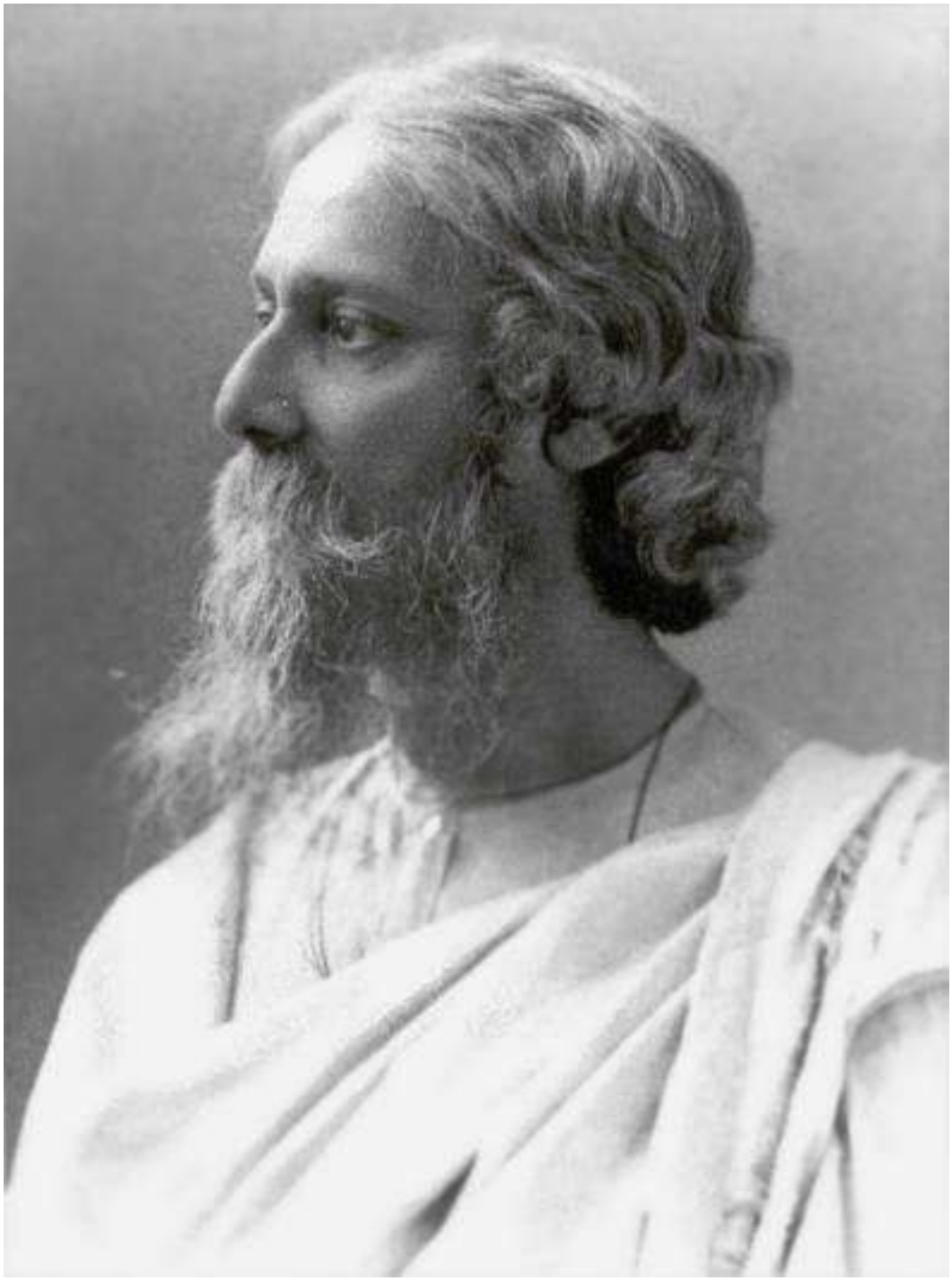

Open Knowledge Foundation Network, India : Open Education Project

Help spreading the light of education. Use and share our books. It is FREE. Educate a child. Educate the economically challenged.

Share and spread the word! Show your support for the cause of Openness of Knowledge.
facebook: https://www.facebook.com/OKFN.India
twitter: https://twitter.com/OKFNIndia
Website: http://in.okfn.org/

প্রথম ভাগ

অ আ

ছোট খোকা বলে অ আ

শেখেনি সে কথা কওয়া।

ই ঈ

হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ

বসে খায় ক্ষীর খই।

উ ঊ

হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ

ডাক ছাড়ে ঘেউ ঘেউ।

ঋ

ঘন মেঘ বলে ঋ

দিন বড় বিশ্রী।

এ ঐ

বাটি হাতে এ ঐ

হাঁক দেয় দে দৈ।

ও ঔ

ডাক পাড়ে ও ঔ

ভাত আনো বড় বৌ।

ক খ গ ঘ

ক খ গ ঘ গান গেয়ে

জেলে ডিঙি চলে বেয়ে।

ঙ

চরে বসে রাঁধে ঙ

চোখে তার লাগে ধোঁয়া।

চ ছ জ ঝ

চ ছ জ ঝ দলে দলে

বোঝা নিয়ে হাটে চলে।

ঞ

ক্ষিদে পায় খুকী ঞ

শুয়ে কাঁদে কিয়োঁ কিয়োঁ।

ট ঠ ড ঢ

ট ঠ ড ঢ করে গোল

কাঁধে নিয়ে ঢাক ঢোল।

ণ

বলে মূর্দ্ধন্য ণ,

চুপ কর কথা শোন।

ত থ দ ধ

ত থ দ ধ বলে, ভাই
আম পাড়ি চল যাই।

ন

রেগে বলে দন্ত্য ন
যাব না তো কক্ষনো।

প ফ ব ভ

প ফ ব ভ যায় মাঠে
সারাদিন ধান কাটে।

ম

ম চালায় গোরু-গাড়ি
ধান নিয়ে যায় বাড়ি।

য র ল ব

য র ল ব বসে ঘরে

এক মনে পড়া করে।

শ ষ স

শ ষ স বাদল দিনে

ঘরে যায় ছাতা কিনে।

হ ক্ষ

শাল মুড়ি দিয়ে হ ক্ষ

কোণে বসে কাশে খ ক্ষ।

প্রথম পাঠ

বনে থাকে বাঘ।

গাছে থাকে পাখী।

জলে থাকে মাছ।

ডালে আছে ফল।

পাখী ফল খায়।

পাখা মেলে ওড়ে।

বাঘ আছে আম-বনে।

গায়ে চাকা চাকা দাগ।

পাখী বনে গান গায়।

মাছ জলে খেলা করে।

ডালে ডালে কাক ডাকে।

খালে বক মাছ ধরে।

বনে কত মাছি ওড়ে।

ওরা সব মৌ-মাছি।

ঐখানে মৌ-চাক।

তাতে আছে মধু ভরা।

—

আলো হয় , জয়লাল

গেল ভয় । ধরে হাল ।

চারি দিক অবিনাশ

ঝিকি মিক্ কাটে ঘাস ।

বায়ু বয় ঝাউডাল

বনময় । দেয় তাল ।

বাঁশ গাছ বুড়ি দাই

করে নাচ । জাগে নাই ।

দীঘিজল হরিহর

ঝল মল । বাঁধে ঘর ।

যত কাক পাতু পাল

দেয় ডাক । আনে চাল ।

খুদিরাম দীননাথ

পাড়ে জাম । রাঁধে ভাত ।

মধু রায় গুরুদাস

খেয়া বায় । করে চাষ ।

—

দ্বিতীয় পাঠ

রাম বনে ফুল পাড়ে। গায়ে তার লাল শাল। হাতে তার সাজি।

জবা ফুল তোলে। বেল ফুল তোলে। বেল ফুল সাদা। জবা ফুল লাল। জলে আছে নাল ফুল।

ফুল তুলে রাম বাড়ি চলে। তার বাড়ি আজ পূজা। পূজা হবে রাতে। তাই রাম ফুল আনে। তাই তার ঘরে খুব ঘটা। ঢাক বাজে, ঢোল বাজে। ঘরে ঘরে ধূপ ধূনা।

পথে কত লোক চলে। গোরু কত গাড়ি টানে। ঐ যায় ভোলা মালী। মালা নিয়ে ছোটে। ছোটো খোকা দোলা চ'ড়ে দোলে।

থালা ভরা কৈ মাছ,বাটা মাছ। সরা ভরা চিনি ছানা। গাড়ি গাড়ি আসে শাক লাউ আলু কলা। ভারী আনে ঘড়া ঘড়া জল। মুটে আনে সরা খুরি কলাপাতা।

রাতে হবে আলো। লাল বাতি। নীল বাতি। কত লোক খাবে। কত লোক গান গাবে। সাত দিন ছুটি। তিন ভাই মিলে খেলা হবে।

—

কালো রাতি গেল ঘুচে,

আলো তারে দিল মুছে।

পূব দিকে ঘুম-ভাঙা।

হাসে ঊষা চোখ-রাঙা।

নাহি জানি কোথা থেকে

ডাক দিল চাঁদেরে কে।

ভয়ে ভয়ে পথ খুঁজি

চাঁদ তাই যায় বুঝি।

তারাগুলি নিয়ে বাতি

জেগেছিল সারা রাতি,

নেমে এল পথ ভুলে

বেলফুলে জুঁইফুলে।

বায়ু দিকে দিকে ফেরে

ডেকে ডেকে সকলেরে।

বনে বনে পাখী জাগে,

মেঘে মেঘে রঙ লাগে।

জলে জলে ঢেউ ওঠে,

ডালে ডালে ফুল ফোটে।

তৃতীয় পাঠ

ঐ সাদা ছাতা। দাদা যায় হাটে। গায়ে লাল জামা। মামা যায় খাতা হাতে। গায়ে শাদা শাল।

মামা আনে চাল ডাল। আর কেনে শাক। আর কেনে আটা।

দাদা কেনে পাকা আতা, সাত আনা দিয়ে। আর, আখ আর জাম চার আনা। বাবা খাবে। কাকা খাবে। আর খাবে মামা। তার পরে কাজ আছে। বাবা কাজে যাবে।

দাদা হাটে যায় টাকা হাতে। চার টাকা। মা বলে, খাজা চাই, গজা চাই, আর ছানা চাই। আশাদাদা খাবে।

আশাদাদা আজ ঢাকা থেকে এল। তার বাসা গড়পারে। আশাদাদা আর তার ভাই কালা কাল ঢাকা ফিরে যাবে।

নাম তার মোতিবিল, বহু দূর জল—
হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল।
পাঁকে চেয়ে থাকে বক, চিল উড়ে চলে,
মাছরাঙা ঝুপ ক'রে পড়ে এসে জলে।
হেথা হোথা ডাঙা জাগে ঘাস দিয়ে ঢাকা,
মাঝে মাঝে জলধারা চলে আঁকাবাঁকা।
কোথাও বা ধানক্ষেত জলে আধো ডোবা,
তারি 'পরে রোদ পড়ে কিবা তার শোভা।
ডিঙি চ'ড়ে আসে চাষী, কেটে লয় ধান,
বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে গেয়ে সারিগান।
মোষ নিয়ে পার হয় রাখালের ছেলে,
বাঁশে বাঁধা জাল নিয়ে মাছ ধরে জেলে।
মেঘ চলে ভেসে ভেসে আকাশের গায়,
ঘন শেওলার দল জলে ভেসে যায়।

—

চতুর্থ পাঠ

বিনিপিসি, বামি আর দিদি ঐ দিকে আছে। ঐ যে তিনজনে ঘাটে যায়।

বামি ঐ ঘটি নিয়ে যায়। সে মাটি নিয়ে নিজে ঘটি মাজে। রানীদিদি যায় না। রানীদিদি ঘরে। তার যে তিনদিন কাশি। তার কাছে আছে মা, মাসি আর কিনি।

চলো ভাই নীলু। এই তালবন দিয়ে পথ। তার পরে তিলক্ষেত। তার পরে তিসিক্ষেত। তার পর দীঘি। জল খুব নীল। ধারে ধারে কাদা। জলে আলো ঝিলিমিলি করে। বক মিটি মিটি চায় আর মাছ ধরে।

ঐ যে বামি ঘটি নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। ভাই, ঘড়ি আছে কি? দেখি। ছ'টা যে বাজে, আর দেরি নয়। এইবার আমি বাড়ি যাই। তুমি এস পিছে পিছে। পাখী খাবে, দেখ এসে।

এ কী পাখী? এ যে টিয়ে পাখী। ও পাখী কি কিছু কথা বলে? কী কথা বলে? ও বলে রাম রাম হরি হরি। ও কী খায়? ও খায় দানা। রানীদিদি ওর বাটি ভ'রে আনে দানা। বুড়ী দাসী আনে জল।

পাখী কি ওড়ে?

না, পাখী ওড়ে না, ওর পায়ে বেড়ি।

ও আগে ছিল বনে। বনে নদী ছিল, ও নিজে গিয়ে জল খেত।

দীনু এই পাখী পোষে।

ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি
আছে আমাদের পাড়াখানি।
দীঘি তার মাঝখানটিতে,

তালবন তারি চারিভিতে।

বাঁকা এক সরু গলি বেয়ে

জল নিতে আসে যত মেয়ে।

বাঁশগাছ ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে,

ঝুরু ঝুরু পাতাগুলি নড়ে।

পথের ধারেতে একখানে

হরিমুদী বসেছে দোকানে।

চাল ডাল বেচে তেল নুন,

খয়ের সুপারি বেচে চুন,

ঢেঁকি পেতে ধান ভানে বুড়ী,

খোলা পেতে ভাজে খই মুড়ি।

বিধু গয়লানী মায়ে পোয়

সকাল বেলায় গোরু দোয়।

আঙিনায় কানাই বলাই

রাশি করে সরিষা কলাই।

বড়বউ মেজবউ মিলে

ঘুঁটে দেয় ঘরের পাঁচিলে।

—

পঞ্চম পাঠ

চুপ ক′রে ব′সে ঘুম পায়। চলো, ঘুরে আসি। ফুল তুলে আনি।

আজ খুব শীত। কচুপাতা থেকে টুপ্ টুপ্ ক'রে হিম পড়ে। ঘাস ভিজে। পা ভিজে যায়। দুখী বুড়ী উনুন-ধারে উবু হয়ে ব'সে আগুন পোহায় আর গুন্ গুন্ গান গায়।

গুপী টুপী খুলে শাল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ওকে চুপি চুপি ডেকে আনি। ওকে নিয়ে যাব কুলবনে। কুল পেড়ে খাব। কুলগাছে টুনটুনি বাসা ক'রে আছে। তাকে কিছু বলিনে।

আজ বুধবার, ছুটি। নুটু তাই খুব খুসি। সেও যাবে কুলবনে। কিছু মুড়ি নেব আর নুন। চড়ি-ভাতি হবে। ঝুড়ি নিতে হবে। তাতে কুল ভ'রে নিয়ে বাড়ি যাব। উমা খুসি হবে। ঊষা খুসি হবে। বেলা হলো। মাঠ ধূ ধূ করে। থেকে থেকে হূ হূ হাওয়া বয়। দূরে ধুলো ওড়ে। চুনি মালী কুয়ো থেকে জল তোলে আর ঘুঘু ডাকে ঘু ঘু।

আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু,পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার,ঢালু তার পাড়ি।
চিক্‌চক্ করে বালি,কোথা নাই কাদা,
এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে শাদা।
কিচিমিচি করে সেথা শালিখের ঝাঁক,
রাতে ওঠে থেকে থেকে শেয়ালের হাঁক।
আর-পারে আমবন তালবন চলে,
গাঁয়ের বামুনপাড়া তারি ছায়াতলে।
তীরে তীরে ছেলেমেয়ে নাহিবার কালে
গামছায় জল ভরি গায়ে তারা ঢালে।
সকালে বিকালে কভু-নাওয়া হলে পরে
আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোটো মাছ ধরে।
বালি দিয়ে মাজে থালা, ঘটিগুলি মাজে,

বধুরা কাপড় কেচে যায় গৃহকাজে।

আষাঢ়ে বাদল নামে,নদী ভর-ভর—

মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।

মহাবেগে কলকল কোলাহল ওঠে,

ঘোলাজলে পাকগুলি ঘুরে ঘুরে ছোটে।

দুই কূলে বনে বনে প'ড়ে যায় সাড়া,

বরষার উৎসবে জেগে ওঠে পাড়া।

ষষ্ঠ পাঠ

বেলা যায়। তেল মেখে জলে ডুব দিয়ে আসি। তার পরে খেলা হবে।

একা একা খেলা যায় না। ঐ বাড়ি থেকে কয়জন ছেলে এলে বেশ হয়।

ঐ-যে আসে শচী সেন, মণি সেন, বংশী সেন। আর ঐ-যে আসে মধু শেঠ আর ক্ষেতু শেঠ। ফুটবল খেলা খুব হবে।

বল নেই। গাছ থেকে ঢেলা মেরে বেল পেড়ে নেব। তেলিপাড়া মাঠে গিয়ে খেলা হবে।

খেলা সেরে ঘরে ফিরে যাব। দেরি হবে না।

বাবা নদী থেকে ফিরে এলে তবে যাব। গিয়ে ভাত খেয়ে খাতা নেব। লেখা বাকি আছে।

এসেচে শরৎ, হিমের পরশ

লেগেচে হাওয়ার 'পরে—

সকালবেলায় ঘাসের আগায়

শিশিরের রেখা ধরে।

আমলকী-বন কাঁপে,যেন তার

বুক করে দুরু দুরু——

পেয়েচে খবর পাতা-খসানোর

সময় হয়েচে শুরু।

শিউলির ডালে কুঁড়ি ভ'রে এল,

টগর ফুটিল মেলা,

মালতীলতায় খোঁজ নিয়ে যায়

মৌমাছি দুই বেলা।

গগনে গগনে বরষণ-শেষে

মেঘেরা পেয়েচে ছাড়া,

বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে,

নাই কোনো কাজে তাড়া।

দীঘিভরা জল করে ঢল-ঢল,

নানা ফুল ধারে ধারে,

কচি ধানগাছে ক্ষেত ভ'রে আছে——

হাওয়া দোলা দেয় তারে।

যে দিকে তাকাই সোনার আলোয়

দেখি যে ছুটির ছবি,

পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই

পূজার দিনের রবি।

সপ্তম পাঠ

শৈল এল কই? ঐ যে আসে ভেলা চ′ড়ে বৈঠা বেয়ে। ওর আজ পৈতে। ওরে কৈলাস দৈ চাই। ভালো

ভৈষা দৈ আর কৈ মাছ। শৈল আজ খৈ দিয়ে দৈ মেখে খাবে।

দৈ তো গয়লা দেয় নি। তৈরি হয় নি। হয়তো বৈকালে দেবে।

পৈতে হবে চিঠি পেয়ে মৈনিমাসি আজ এল। মৈনিমাসি বৈশাখ মাসে ছিল নৈনিতালে। তাকে যেতে হবে চৈবাসা। তার বাবা থাকে গৈলা।

গৈলা কোথা?

জানো না, গৈলা বরিশালে। সেইখানে থাকে বেণী বৈরাগী। এখন সে থাকে নৈহাটি।

কাল ছিল ডাল খালি,
আজ ফুলে যায় ভ′রে।
বল্ দেখি তুই মালী,
হয় সে কেমন ক′রে।
গাছের ভিতর থেকে
করে ওরা যাওয়া -আসা।
কোথা থাকে মুখ ঢেকে,
কোথা যে ওদের বাসা।
থাকে ওরা কান পেতে
লুকানো ঘরের কোণে,
ডাক পড়ে বাতাসেতে

কী ক′রে সে ওরা শোনে।

দেরি আর সহে না-যে,

মুখ মেজে তাড়াতাড়ি

কত রঙে ওরা সাজে,

চ′লে আসে ছেড়ে বাড়ি।

ওদের সে-ঘরখানি

থাকে কি মাটির কাছে?

দাদা বলে,জানি জানি

সে-ঘর আকাশে আছে।

সেথা করে আসা যাওয়া

নানা রঙা মেঘগুলি—

আসে আলো, আসে হাওয়া

গোপন দুয়ার খুলি।

এ ছন্দটি দুই মাত্রায় অথবা তিন মাত্রায় পড়া যায়।

দুই মাত্রা,যথা —

কাল। ছিল। ডাল। খালি

আজ। ফুলে। যায়। ভ′রে।

তিন মাত্রা, যথা—

কাল ছিল ডাল। খালি—।

আজ ফুলে যায়। ভ′রে—।

তিন মাত্রার তালে পড়লেই ভালো হয়।

অষ্টম পাঠ

ভোর হ′লো। ধোবা আসে। ঐ তো লোকা ধোবা। গোরা বাজারে বাসা। ওর খোকা খুব মোটা, গাল ফোলা।

ঐ-যে ওর পোষা গাধা। ওর পিঠে বোঝা। খুলে দেখো। আছে ধুতি। আছে জামা, মোজা, সাড়ি। আরো কত কী।

ওর খুড়ো সুতো বেচে, উল বেচে। ওর মেসো বেচে ফুলের তোড়া।

ধোবা কোথা ধুতি কাচে,জানো? ঐ-যে ডোবা, ওখানে। ওর জল বড়ো ঘোলা।

গাধা ছোলা খেতে ভালোবালে। ওকে কিছু ছোলা খেতে দাও।

ছোলা কোথা পাব? ঐ-যে ঘোড়া ছোলা খায়। ওর ঘর খোলা আছে।

ঐ কোঠাবাড়ি। ওখানে আজ বিয়ে। তাই ঢের ঘোড়া এলো,গাড়ি এলো। এক জোড়া হাতি এলো। মেজো মেসো হাতি চ′ড়ে আসে। ওটা বুড়ো হাতি। তার নাতি ঘোড়া চড়ে। কালো ঘোড়া। পিঠে ডোরা দাগ। পায়ে তার ফোড়া, জোড়ে চলে না। ঢোল বাজে। ঘোড়া ঘোর ভয় পায়।

দিনে হই এক-মতো, রাতে হই আর।
রাতে-যে স্বপন দেখি মানে কী-যে তার।
আমাকে ধরিতে যেই এলো ছোটো কাকা
স্বপনে গেলাম উড়ে মেলে দিয়ে পাখা।

দুই হাত তুলে কাকা বলে, থামো থামো,

যেতে হবে ইসকুলে, এই বেলা নামো।

আমি বলি,কাকা, মিছে করো চেঁচামেচি,

আকাশেতে উঠে আমি মেঘ হয়ে গেচি।

ফিরিব বাতাস বেয়ে রামধনু খুঁজি,

আলোর অশোক-ফুল চুলে দেবো গুঁজি।

সাত-সাগরের পারে পারিজাত-বনে

জল দিতে চ'লে যাবো আপনার মনে।

যেমনি এ কথা বলা অমনি হঠাৎ

কড়কড় রবে বাজ মেলে দিল দাঁত।

ভয়ে কাঁপি, মা কোথাও নেই কাছাকাছি,

ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি বিছানায় আছি।

নবম পাঠ

এসো এসো, গৌর এসো। ওরে কৌলু, দৌড়ে যা। চৌকি আন্।

গৌর, হাতে ঐ কৌটো কেন?

ঐ কৌটো ভ'রে মৌরি রাখি। মৌরি খেলে ভালো থাকি।

তুমি কী ক'রে এলে গৌর?

নৌকো ক'রে।

কোথা থেকে এলে?

গৌরীপুর থেকে।

পৌষ মাসে যেতে হবে গৌহাটি।

গৌর, জানো ওটা কী পাখী।

ও তো বৌ-কথা-কও।

না, ওটা নয়। ঐ-যে জলে, যেখানে জেলে মৌরলা মাছ ধরে।

ওটা তো পানকৌড়ি। চলো, এবার খেতে চলো। সৌরিদিদি ভাত নিয়ে ব'সে আছে।

নদীর ঘাটের কাছে
নৌকো বাঁধা আছে,
নাইতে যখন যাই, দেখি সে
জলের ঢেউয়ে নাচে।
আজ গিয়ে সেইখানে
দেখি দূরের পানে
মাঝনদীতে নৌকো, কোথায়
চলে ভাঁটার টানে।
জানি না কোন্ দেশে
পৌঁচে যাবে শেষে,
সেখানেতে কেমন মানুষ

থাকে কেমন বেশে।

থাকি ঘরের কোণে,

সাধ জাগে মোর মনে,

অম্নি ক'রে যাই ভেসে, ভাই,

নতুন নগর বনে।

দূর সাগরের পারে,

জলের ধারে ধারে,

নারিকেলের বনগুলি সব

দাঁড়িয়ে সারে সারে।

পাহাড়-চুড়া সাজে

নীল আকাশের মাঝে,

বরফ ভেঙে ডিঙিয়ে যাওয়া

কেউ তা পারে না-যে।

কোন্ সে বনের তলে

নতুন ফুলে ফলে

নতুন নতুন পশু কত

বেড়ায় দলে দলে!

কত রাতের শেষে

নৌকো-যে যায় ভেসে;

বাবা কেন আপিসে যায়,

যায় না নতুন দেশে?

দশম পাঠ

বাঁশগাছে বাঁদর। যত ঝাঁকা দেয় ডাল তত কাঁপে।

ওকে দেখে পাঁচু ভয় পায়, পাছে আঁচড় দেয়।

বাঁশগাছ থেকে লাফ দিয়ে বাঁদর গেল চাঁপাগাছে। কী জানি, কখন ঝাঁপ দিয়ে নীচে পড়ে।

এইবার বাঁদর ভয় পেয়েচে। ভোঁদা কুকুর ওকে দেখে ডাকচে। খাঁদু ওকে ঢিল ছুঁড়ে তাড়া করেচে।

পাঁচটা বেজে গেচে।

ঝাঁকায় কাঁচা আম নিয়ে মধু গলিতে হেঁকে যায়।

আঁধার হ'লো। ঐ-যে চাঁপাগাছের ফাঁকে বাঁকা চাঁদ। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস উড়ে গেল।

দূরে ঠাকুর-ঘরে শাঁক বাজে, কাঁসি বাজে। কানাই ছাদে ব'সে বাঁশি বাজায়।

ঐ কে যেন কাঁদে।

না, কাঁদা নয়, কাঁটা গাছে পেঁচা ডাকে।

কত দিন ভাবে ফুল উড়ে যাবো কবে ,
যেথা খুসি সেথা যাবো ভারী মজা হবে ।
তাই ফুল একদিন মেলি দিল ডানা ,
প্রজাপতি হ ' লো , তারে কে করিবে মানা!

রোজ রোজ ভাবে ব ' সে প্রদীপের আলো
উড়িতে পেতাম যদি হ ত বড়ো ভালো ।
ভাবিতে ভাবিতে শেষে কবে পেলো পাখা ,
জোনাকি হ ' লো সে —— ঘরে যায় না তো রাখা ।

পুকুরের জল ভাবে , চুপ ক ' রে থাকি ,
হায় হায় , কী মজায় উড়ে যায় পাখী ।
তাই একদিন বুঝি ধোঁয়া-ডানা মেলে
মেঘ হয়ে আকাশেতে গেল অবহেলে ।

আমি ভাবি ঘোড়া হয়ে মাঠ হবো পার ,
কভু ভাবি মাছ হয়ে কাটিব সাঁতার ।
কভু ভাবি পাখী হয়ে উড়িব গগনে ।
কখোনো হবে না সে কি ভাবি যাহা মনে ?

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পাঠ

বাদল করেছে মেঘের রং ঘন নীল। ঢং ঢং ক'রে ৯টা বাজল। বংশু ছাতা মাথায় কোথায় যাবে? ও যাবে সংসারবাবুর বাসায়। সেখানে কংসবধের অভিনয় হবে। আজ মহারাজ হংসরাজসিংহ আসবেন। কংসবধ অভিনয় তাঁকে দেখাবে। বাংলাদেশে তাঁর বাড়ি নয়। তিনি পাংশুপুরের রাজা। সংসারবাবু তাঁরি সংসারে কাজ করেন। কাংলা,তুই বুঝি সংসারবাবুর বাসায় চলেছিস? সেখানে কংসবধে সং সাজতে হবে। কাংলা, তোর ঝুড়িতে কী? ঝুড়িতে আছে পালং শাক, পিড়িং শাক, ট্যাংরা মাছ, চিংড়ি মাছ। সংসারবাবুর মা চেয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠ

আজ আদ্যনাথবাবুর কন্যার বিয়ে—— তাঁর এই শল্যপুরের বাড়িতে। কন্যার নাম শ্যামা। বরের নাম বৈদ্যনাথ। বরের বাড়ি অহল্যাপাড়ায়। তিনি আর তাঁর ভাই সৌম্য পাটের ব্যবসা করেন। তাঁর এক ভাই ধৌম্যনাথ কলেজে পড়ে, আর রম্যনাথ ইস্কুলে। আদ্যনাথ বড়ো ভালো লোক। দান-ধ্যান পুণ্যকাজে তাঁর মন। দেশের জন্য অনেক কাজ করেন। সবাই বলে,তিনি ধন্য। আদ্যনাথবাবু তাঁর ভৃত্য সত্যকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমি বলেছি তাঁর কন্যার বিবাহে অবশ্য অবশ্য যাব। এখানে এসে দেখি, আঙিনায় বাদ্য বাজছে। চাষীরা এ বৎসর ভালো শস্য পেয়েছে। তাই তারা ভিড় ক'রে এসেছে। ভিতরে ঢুকি—— সাধ্য কী! অগত্যা বাইরে ব'সে আছি। দেখছি, ছেলেরা খুশী হয়ে নৃত্য করচে। কেউ বা ব্যাটবল খেলছে। নিত্যশরণ ওদের ক্যাপ্‌টেন।

হাট

কুমোর-পাড়ার গোরুর গাড়ি —

বোঝাই-করা কল্‌সি হাঁড়ি ।

গাড়ি চালায় বংশীবদন ,

সঙ্গে-যে যায় ভাগ্নে মদন ।

হাট বসেচে শুক্রবারে

বক্সীগঞ্জে পদ্মাপারে ।

জিনিষপত্র জুটিয়ে এনে

গ্রামের মানুষ বেচে কেনে ।

উচ্ছে বেগুন পটল মূলো,

বেতের বোনা ধামা কুলো ,

সর্ষে ছোলা ময়দা আটা,

শীতের র‍্যাপার নক্‌শাকাটা ।

ঝাঁঝ্‌রি কড়া বেড়ি হাতা ,

শহর থেকে সস্তা ছাতা ।

কল্‌সি-ভরা এখো গুড়ে

মাছি যত বেড়ায় উড়ে ।

খড়ের আঁটি নৌকো বেয়ে

।

অন্ধ কানাই পথের ‘ পরে

গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে!

পাড়ার ছেলে স্নানের ঘাটে

জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটে ।

তৃতীয় পাঠ

আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করবার দিন। সব ছেলেরা দঙ্গল বেঁধে যাবে। রঙ্গলালবাবুও এখনি আসবেন। আর আসবেন তাঁর দাদা বঙ্গবাবু। সিদ্ধি, তুমি দৌড়ে যাও তো। অনঙ্গদাদাকে ধরো, মোটরগাড়িতে তাঁদের আনবেন। সঙ্গে নিতে হবে কুড়ুল, কোদাল, ঝাঁটা, ঝুড়ি। আর নেব ভিঙ্গি মেথরকে। এবার পঙ্গপাল এসে বড়ো ক্ষতি করেছে। ক্ষিতিবাবুর ক্ষেতে একটি ঘাস নেই। অক্ষয়বাবুর বাগানে কপির পাতাগুলো খেয়ে সাঙ্গ ক'রে দিয়েছে। পঙ্গপাল না তাড়াতে পারলে এবার কাজে ভঙ্গ দিতে হবে। ঈশানবাবু ইঙ্গিতে বলেছেন, তিনি কিছু দান করবেন।

চতুর্থ পাঠ

চন্দননগর থেকে আনন্দবাবু আসবেন। তিনি আমার পাড়ার কাজ দেখতে চান। দেখো, যেন নিন্দা না হয়। ইন্দুকে ব'লে দিয়ো, তাঁর আতিথ্যে যেন খুঁত না থাকে। তাঁর ঘরে সুন্দর দেখে ফুলদানি রেখো। তাতে কুন্দফুল থাকবে আর আকন্দ থাকবে। রঙ্গু বেহারাকে ব'লো, তাঁর শোবার ঘরে তাঁর তোরঙ্গ যেন রাখে। ঘর বন্ধ যেন না থাকে। সন্ধ্যা হ'লে ঘরে ধুনোর গন্ধ দিয়ো। দীনবন্ধুকে রেখো পাশের ঘরেই। তাঁদের সঙ্গে সিন্ধুবাবু আসবেন, তাঁকে অন্য ঘরে রাখতে হবে। বিন্দুকে ব'লে মালাচন্দন তৈরি রাখা চাই। বন্দেমাতরং গান নন্দী জানে তো? সেই অন্ধ গায়ককেও ডেকে এনো। সে তো মন্দ গায় না।

পঞ্চম পাঠ

বর্ষা নেমেছে। গর্মি আর নেই। থেকে থেকে মেঘের গর্জন আর বিদ্যুতের চমকানি চলছে। শিলং পর্বতে ঝর্নার জল বেড়ে উঠলো। কর্ণফুলি নদীতে বন্যা দেখা দিয়েছে। সর্ষে ক্ষেত ডুবিয়ে দিলে। দুর্গানাথের আঙিনায় জল উঠেছে। তার দর্মার বেড়া ভেঙে গেল। বেচারা গোরুগুলোর বড়ো দুর্গতি। এক হাঁটু পাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। চাষীদের কাজকর্ম সববন্ধ। ঘরে ঘরেসর্দি-কাশি। কর্তাবাবু বর্ষাতি প'রে চলেছেন। সঙ্গে তাঁর আর্দালি তুর্কি মিঞা। গর্ত সব ভ'রে গিয়ে ব্যাঙের বাসা হল। পাড়ার নর্দমাগুলো জলে ছাপিয়ে গেছে।

ঐখানে মা পুকুর পাড়ে

জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
হোথায় হব বনবাসী—
কেউ কোথাও নেই।
ঐখানে ঝাউতলা জুড়ে
বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,
শুক্‌নো পাতা বিছিয়ে ঘরে
থাকব দুজনেই।
বাঘ ভাল্লুক, অনেক আছে—
আসবে না কেউ তোমার কাছে,
দিনরাত্তির কোমর বেঁধে
থাকব পাহারাতে।
রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে
মারবে উঁকি আড়ে আড়ে,
দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি
ধনুক নিয়ে হাতে।
আঁচলেতে খই নিয়ে তুই
যেই দাঁড়াবি দ্বারে
অম্‌নি যত বনের হরিণ
আসবে সারে সারে।
শিংগুলি সব আঁকাবাঁকা,
গায়েতে দাগ চাকা চাকা,
লুটিয়ে তারা পড়বে ভুঁয়ে
পায়ের কাছে এসে।
ওরা সবাই আমায় বোঝে,

করবে না ভয় একটুও-যে

হাত বুলিয়ে দেব গায়ে—

বসবে কাছে ঘেঁসে।

ফল্‌সাবনে গাছে গাছে

ফল ধ'রে মেঘ ঘনিয়ে আছে,

ঐখানেতে ময়ূর এসে

নাচ দেখিয়ে যাবে।

শালিখরা সব মিছিমিছি

লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি,

কাঠবেড়ালি ল্যাজটি তুলে

হাত থেকে ধান খাবে।

ষষ্ঠ পাঠ

উস্রি নদীর ঝর্না দেখতে যাব। দিনটা বড়ো বিশ্রী। শুনছ বজ্রের শব্দ? শ্রাবণ মাসের বাদ্‌লা। উস্রিতে বান নেমেছে। জলের স্রোত বড়ো দুরন্ত। অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে। অনন্ত, এসো একসঙ্গে যাত্রা করা যাক। আমাদের দু-দিন মাত্র ছুটি। কালেজের ছাত্রেরা গেছে ত্রিবেণী, কেউ বা গেছে আত্রাই। সাঁত্রাগাছির কান্তি মিত্র যাবে আমাদের সঙ্গে উস্রির ঝর্নায়। শান্তা কি যেতে পারবে? সে হয়তো শ্রান্ত হয়ে পড়বে। পথে যদি জল নামে মিশ্রদের বাড়ি আশ্রয় নেব। সঙ্গে খাবার আছে তো? সন্দেশ আছে, পান্তোয়া আছে, বোঁদে আছে। আমাদের কান্ত চাকর শীঘ্র কিছু খেয়ে নিক্। তার খাবার আগ্রহ দেখি নে। সে ভোরের বেলায় পান্তা ভাত খেয়ে বেরিয়েছে। তার বোনক্ষান্তমণি তাকে খাইয়ে দিলে।

সপ্তম পাঠ

শ্রীশকে বোলো, তার শরীর যদি সুস্থ থাকে সে যেন বসন্তর দোকানে যায়। সেখান থেকে খাস্তা কচুরি আনা চাই। আর কিছু পেস্তা বাদাম

কিনে আনতে হবে। দোকানের রাস্তা সে জানে তো? বাজারে একটা আস্ত কাতলা মাছ যদি পায়, নিয়ে আসে যেন। আর বস্তা থেকে গুন্তি ক'রে ত্রিশটা আলু আনা চাই। এবার আলু খুব সস্তা। একান্ত যদি না পাওয়া যায়, কিছু ওল অনিয়ে নিয়ো। রাস্তায় রেঁধে খেতে হবে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। মনে রেখো— কড়া চাই, খুন্তি চাই জলের পাত্র একটা নিয়ো। অত ব্যস্ত হয়েছ কেন। আস্তে আস্তে চলো ক্লান্ত হয়ে পড়বে-যে।

আমি-যে রোজ সকাল হ'লে
যাই শহরের দিকে চ'লে
তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চ'ড়ে
সকাল থেকে সারা দুপুর
ইঁট সাজিয়ে ইঁটের উপর
খেয়ালমত দেয়াল তুলি গ'ড়ে।
সমস্ত দিন ছাতপিটুনী
গান গেয়ে ছাত পিটোয় শুনি,
অনেক নীচে চলচে গাড়ি ঘোড়া।
বাসনওয়ালা থালা বাজায়,
সুর ক'রে ঐ হাঁক দিয়ে যায়
আতাওয়ালা নিয়ে ফলের ঝোড়া,
সাড়ে চারটে বেজে ওঠে,
ছেলেরা সব বাসায় ছোটে
হোহো ক'রে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো,—
রোদ্দুর যেই আসে প'ড়ে
পুবের মুখে কোথা ওড়ে
দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।
আমি তখন দিনের শেষে
ভারার থেকে নেমে এসে

আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে,
জানো না কি আমার পাড়া
যেখানে ওই খুঁটি-গাড়া
পুকুরপাড়ে গাজনতলার বাঁয়ে।

অষ্টম পাঠ

আর্মানি গির্জের কাছে আপিস। যাওয়া মুস্কিল হবে। পূর্বদিকের মেঘ ইস্পাতের মতো কালো। পশ্চিম দিকের মেঘ ঘন নীল। সকালে রৌদ্র ছিল, নিশ্চিন্ত ছিলাম। দেখতে দেখতে বিস্তর মেঘ জমেছে। বাদ্‌লা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হলে বাঁচি। শরীরটা অসুস্থ আছে। মাথা ধরেছে, স্থির হয়ে থাকতে পারছি নে। আপিসের ভাত এখনো হল না। উনানের আগুনটা উস্কিয়ে দাও। ঠাকুর আমার ঝোলে যেন লঙ্কা না দেয়। বঙ্কিমকে আমার অঙ্কের খাতাটা আনতে বোলো। দোতলা ঘরের পালঙ্কের উপর আছে।কঙ্কা খাতা নিয়ে খেলতে গিয়ে তার পাতা ছিঁড়ে দিয়েছে।

নবম পাঠ

বৃষ্টি নামল দেখছি। সৃষ্টিধর, ছাতাটা খুঁজে নিয়ে আয়, না পেলে ভারী কষ্ট হবে। কেষ্ট, শিষ্ট শান্ত হয়ে ঘরে ব'সে থাকো। দুষ্টামি কোরো না। বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে। সঞ্জীবকে ব'লে দেব, তোমার জন্যে মিষ্টি লজঞ্চুস এনে দেবে। কাল-যে তোমাকে খেলার খঞ্জনী দিলাম সেটা হারিয়েছ বুঝি? ও বাড়ি থেকে রঞ্জনকে ডেকে দেব, সে তোমার সঙ্গে খেলা করবে। কাঞ্জিলাল, ব্যাঙগুলো ঘরের মধ্যে আসে-যে, ঘর নষ্ট করবে। ওরে তুষ্টু, ওদের তাড়িয়ে দে। ঘন মেঘে সব অস্পষ্ট হয়ে এলো। আর দৃষ্টি চলে না। বোষ্টমী গান গাইতে এসেছে। ওকে নিষ্ঠুর হয়ে বাইরে রেখো না। বৃষ্টিতে ভিজে যাবে, কষ্ট পাবে।

সেদিন ভোরে দেখি উঠে
বৃষ্টি বাদল গেছে ছুটে,
রোদ উঠেছে ঝিল্‌মিলিয়ে
বাঁশের ডালে ডালে,

ছুটির দিনে কেমন সুরে
পূজোর সানাই বাজায় দূরে,
তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে।
শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কাদের ছাদের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগনি রঙের শাড়ি,
চেয়ে চেয়ে চুপ ক'রে রই—
তেপান্তরের পার বুঝি ওই,
মনে ভাবি ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।
থাকতো যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া
তক্ষনি-যে যেতেম তারে
লাগাম দিয়ে ক'ষে,
যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় ব'সে।

দশম পাঠ

এত রাত্রে দরজায় ধাক্কা দিচ্চে কে? কেউ না, বাতাস ধাক্কা দিচ্চে। এখন অনেক রাত্রি। উল্লাসপাড়ার মাঠে শেয়াল ডাকছে- হুক্কাহুয়া। রাস্তায় ও কি এক্কাগাড়ির শব্দ? না, মেঘ গুর্‌গুর্‌ করছে। উল্লাস, তুমি যাও তো, কুকুরের বাচ্ছাটা বড়ো চেঁচাচ্ছে, ঘুমতে দিচ্ছে না। ওকে শান্ত ক'রে এসো। ওটা কিসের ডাক উল্লাস? অশত্থ গাছে পেঁচার ডাক। উচ্ছের ক্ষেত থেকে ঝিল্লি ঐ ঝিঁ ঝিঁ করছে। দরজার পাল্লাটা বাতাসে ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ ক'রে পড়ছে! বন্ধ করে দাও। ওটা কি কান্নার শব্দ? না, রান্নাঘর থেকে বিড়াল ডাকছে। যাও-না উল্লাস, থামিয়ে দিয়ে এসোগে। আমার ভয় করছে। বড়ো অন্ধকার। ভজ্জুকে ডেকে দিই। ছি ছি উল্লাস, ভয় করতে লজ্জা করে না? আচ্ছা, আমি নিজে যাচ্ছি। আর তো রাত নেই। পুব দিক উজ্জ্বল হয়েছে। ও ঘরে বিছানায় খুকী চঞ্চল হয়ে উঠল। বাঞ্ছাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দাও। বাঞ্ছা শীঘ্র আমার জন্যে চা আনুক আর কিঞ্চিৎ বিস্কুট। আমি ততক্ষণ মুখ ধুয়ে আসি। রক্ষামণি, থাকো খুকুর কাছে। তুমিও সাজসজ্জা ক'রে তৈরী থাকো উল্লাস। বেড়াতে যাবো। উত্তম কথা। কিন্তু ঘাস ভিজে কেন? এক পত্তন বৃষ্টি হয়ে গেল বুঝি। এবার লণ্ঠনটা নিবিয়ে দাও। আর মণ্টুকে বলো, বারান্দা পরিষ্কার করে দিক। এখনি রেভারেণ্ড্‌ এন্ড্রার্‌সেন আসবেন। পণ্ডিত মশায়েরও আসবার সময় হল। ঐ শোনো, কুণ্ডুদের বাড়ি ঢং ঢং ক'রে ছটার ঘণ্টা বাজল।

—

আকাশপারে পুবের কোণে
কখন যেন অন্যমনে
ফাঁক ধরে ঐ মেঘে,
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে
বন্ধ চোখের পাতা মেলে
আকাশ ওঠে জেগে।
ছিঁড়ে-যাওয়া মেঘের থেকে
পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে
লাগায় ঝিলিমিলি,
বাঁশবাগানের মাথায় মাথায়
তেঁতুলগাছের পাতায় পাতায়
হাসায় খিলিখিলি।
হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে
ভুলিয়ে দিলে এক নিমেষে

বাদলবেলার কথা,

হারিয়ে পাওয়া আলোটিরে

নাচায় ডালে ফিরে ফিরে

ঝুমকো ফুলের লতা।

—

একাদশ পাঠ

ভক্তরামের নৌকো শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি। ভক্তরাম সেই নৌকো সস্তা দামে বিক্রি করে। শক্তিনাথবাবু কিনে নেন। শক্তিনাথ আর মুক্তিনাথ দুই ভাই। যে-পাড়ায় থাকেন তার নাম জেলেবস্তি। তাঁর বাড়ি খুব মস্ত। সামনে নদী, পিছনে বড়ো রাস্তা। তাঁর দরোয়ান শম্ভু সিং আর আক্রম মিশ্র রোজ সকালে কুস্তি করে। শক্তিনাথবাবুর চাকরের নাম অক্রূর। তাঁর বড়ো ছেলের নাম বিক্রম। ছোটো ছেলের নাম শত্রুনাথ। শক্তিবাবু তাঁর নৌকো লাল রঙ ক'রে নিলেন। তার নাম দিলেন রক্তজবা। তিনি মাঝে মাঝে নৌকোয় ক'রে কখনো তিস্তা নদীতে কখনো আত্রাই নদীতে কখনো ইচ্ছামতীতে বেড়াতে যান। একদিন অঘ্রান মাসে পত্র পেলেন, বিপ্রগ্রামে বাঘ এসেছে। শিকারে যাত্রা করলেন। সেদিন শুক্রবার। শুক্লপক্ষের চন্দ্র সবে অস্ত গেচে। আক্রম বন্দুক নিয়ে চললো। আরো দুটোবল্লম ছিল। সিন্দুকে ছিল গুলি বারুদ। নদীতে প্রবল স্রোত। বেলা যখন দুই প্রহর, নৌকো নন্দগ্রামে পৌঁছলো। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। এক ভদ্রলোক খবর দিলেন, কাছেই বন্দীপুরের বন, সেখানে আছে বাঘ।

শক্তিবাবু আর আক্রম বাঘ খুঁজতে নামলেন। জঙ্গল ঘন হয়ে এলো। ঘোর অন্ধকার। কিছু দূরে গিয়ে দেখেন, এক পোড়ো মন্দির। জনপ্রাণী নেই। শক্তিবাবু বললেন, এইখানে একটু বিশ্রাম করি। সঙ্গে ছিল লুচি, আলুর দম আর পাঁঠার মাংস। তাই খেলেন। আক্রম খেলো চাট্‌নি দিয়ে রুটি। তখন বেলা প'ড়ে আসছে। গাছের ফাঁক দিয়ে বাঁকা হয়ে রৌদ্র পড়ে।প্রকাণ্ড অর্জুন গাছের উপর কতকগুলো বাঁদর; তাদের লম্বা ল্যাজ ঝুলছে। শক্তিবাবু কিছু দূরে গিয়ে দেখলেন, একটা ছোটো সোঁতা। তাতে এক হাঁটুর বেশি জল হবে না। তার ধারে বালি। সেই বালির উপর বড়ো বড়ো থাবার দাগ। নিশ্চয় বাঘের থাবা। শক্তিবাবু ভাবতে লাগলেন, কী করা কর্তব্য। অঘ্রান মাসের বেলা। পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত গেল। সন্ধ্যা হ'তেই ঘোর অন্ধকার। কাছে তেঁতুল গাছ। তার উপরে দুজনে চ'ড়ে বসলেন। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে চাদর দিয়ে নিজেদের বাঁধলেন। পাছে ঘুম এলে প'ড়ে যান। কোথাও আলো নেই। তারা দেখা যায় না। কেবল অসংখ্য জোনাকি গাছে গাছে জ্বলছে।

শক্তিবাবুর একটু নিদ্রা এসেছে এমন সময় হঠাৎ ধুপ্ ক'রে একটা শব্দ হওয়াতে চমকে জেগে উঠলেন। দেখলেন কখন বাঁধন আল্‌গা হয়ে আক্রম নীচে প'ড়ে গেছে। শক্তিনাথ তাকে দেখতে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। হঠাৎ দেখেন, কাছেই অন্ধকারে দুটো চোখজ্বলজ্বল করছে। কী সর্বনাশ! এ তো বাঘের চোখ। বন্দুক তোলবার সময় নেই। ভাগ্যে দুজনের কাছে দুটো বিজ্‌লি বাতির মশাল ছিল। সে-দুটো যেমনি হঠাৎ জ্বালানো অমনি বাঘ ভয়ে দৌড় দিলে। সে-রাত্রি আবার দুজনের গাছে কাটল। পরের দিন সকাল হ'লো। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা মেলে না, যতই চলেন জঙ্গল বেড়ে যায়। গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগে। রক্ত পড়ে। খিদে পেয়েছে। তেষ্টা পেয়েছে। এমন সময় মানুষের গলার শব্দ শোনা গেল। এক দল কাঠুরিয়া কাঠ কাটতে চলেছে। শক্তিবাবু বললেন—— তোমাদের ঘরে নিয়ে চলো। রাস্তা ভুলেছি। কিছু খেতে দাও। নদীর ধারে একটা ঢিবির 'পরে তাদের কুঁড়ে ঘর। গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া। কাছে একটা মস্ত বটগাছ। তার ডাল থেকে লম্বা লম্বা ঝুরি নেমেছে। সেই গাছে যত রাজ্যের পাখীর বাসা।

কাঠুরিয়ারা শক্তিবাবুকে আক্রমকে যত্ন ক'রে খেতে দিলে। তালপাতার ঠোঙায় এনে দিলে চিঁড়ে আর বনের মধু। আর দিলে ছাগলের দুধ। নদী থেকে ভাঁড়ে ক'রে এনে দিলে জল। রাত্রে ভালো ঘুম হয় নি। শরীর ছিল ক্লান্ত। শক্তিবাবু বটের ছায়ায় শুয়ে ঘুমোলেন। বেলা যখন চার প্রহর তখন কাঠুরিয়ার সর্দার পথ দেখিয়ে নৌকোয় তাঁদের পৌঁছিয়ে দিলে।শক্তিবাবু দশ টাকার নোট বের ক'রে বললেন, বড়ো উপকার করেছো, বক্‌শিশ লও। সর্দার হাতজোড় ক'রে বললে, মাপ করবেন, টাকা নিতে পারবো না—— নিলে অধর্ম হবে। এই ব'লে নমস্কার ক'রে সর্দার চ'লে গেল।

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু
"চেয়ে দেখো" "চেয়ে দেখো" বলে যেন বিনু।
চেয়ে দেখি, ঠোকাঠুকি বরগা কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।
ইঁটে-গড়া গণ্ডার বাড়িগুলো সোজা
চলিয়াছে দুদ্দাড় জানালা দরজা।
রাস্তা চলেচে যত অজগর সাপ,
পিঠে তার ট্রামগাড়ি পড়ে ধুপ্ ধাপ্।
দোকান বাজার সব নামে আর উঠে,
ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে।
হাওড়ার ব্রিজ চলে মস্ত সে বিছে,
হ্যারিসন্ রোড চলে তার পিছে পিছে।

মনুমেণ্টের দোল যেন ক্ষ্যাপা হাতি

শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি।

আমাদের ইস্‌কুল ছোটে হন্‌হন্‌,

অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।

ম্যাপগুলো দেয়ালেতে করে ছট্‌ফট্‌,

পাখি যেন মারিতেছে পাখার ঝাপট।

ঘণ্টা কেবলি দোলে ঢঙ্‌ ঢঙ্‌ বাজে—

যত কেন বেলা হোক তবু থামে না-যে।

লক্ষ লক্ষ লোক বলে, ‘‘থামো থামো’’।

কোথা হতে কোথা যাবে এ কী পাগ্‌লামো।’’

কলিকাতা শোনে না কো চলার খেয়ালে—

নৃত্যের নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে।

আমি মনে মনে ভাবি চিন্তা তো নাই,

কলিকাতা যাক নাকো সোজা বোম্বাই।

দিল্লি লাহোরে যাক, যাক না আগরা,

মাথায় পাগ্‌ড়ি দেবো, পায়েতে নাগ্‌রা।

কিম্বা সে যদি আজ বিলাতেই ছোটে

ইংরেজ হবে সবে বুট হ্যাট্‌ কোটে।

কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই

দেখি, কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই।।

দ্বাদশ পাঠ

গুপ্তিপাড়ার বিশ্বম্ভরবাবু পাল্কী চ'ড়ে চলেচেন সপ্তগ্রামে। ফাল্গুন মাস। কিন্তু এখনো খুব ঠাণ্ডা। কিছু আগে প্রায় সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বিশ্বম্ভরবাবুর গায়ে এক মোটা কম্বল। পাল্কীর সঙ্গে চলেচে তাঁর শম্ভু চাকর, হাতে এক লম্বা লাঠি। পাল্কীর ছাদে ওষুধের বাক্স, দড়ি দিয়ে বাঁধা। শম্ভুর গায়ে অদ্ভুত জোর। একবার কুম্ভীরার জঙ্গলে তাকে ভল্লুকে ধরেছিলো। সঙ্গে বন্দুক ছিল না, শুদ্ধ কেবল লাঠি নিয়ে ভল্লুকের সঙ্গে তার যুদ্ধ হলো। শম্ভুর হাতের লাঠি খেয়ে ভল্লুকের মেরুদণ্ড গেল ভেঙ্গে। আর তার উত্থানশক্তি রইলো না। আর একবার শম্ভু বিশ্বম্ভরবাবুর সঙ্গে গিয়েছিল স্বর্ণগঞ্জে। সেখানে পদ্মানদীর চরে রান্না চড়াতে হবে। তখন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন পদ্মার ধারে ছোটো ছোটো ঝাউগাছের জঙ্গল। উনান ধরানো চাই। দা নিয়ে শম্ভু ঝাউডাল কেটে আঁটি বাধলো। অসহ্য রৌদ্র। বড়ো তৃষ্ণা পেয়েছে। নদীতে শম্ভু জল খেতে গেল। এমন সময় দেখলে,একটা বাছুরকে ধরেছে কুমীরে। শম্ভু এক লম্ফে জলে পড়ে কুমীরের পিঠে চ'ড়ে বসল। দা দিয়ে তার গলায় পোঁচ দিতে লাগল। জল লাল হয়ে উঠল রক্তে। কুমীর যন্ত্রণায় বাছুরকে দিল ছেড়ে। শম্ভু সাঁতার দিয়ে ডাঙায় উঠে এলো। বিশ্বম্ভরবাবু ডাক্তার। রোগী দেখতে চলেছেন বহুদূরে। সেখানে ইষ্টিমার ঘাটের ইস্টেশন্-মাস্টার মধু বিশ্বাস, তাঁর ছোটো ছেলের অম্লশূল, বড়ো কষ্ট পাচ্ছে।

বিষ্ণুপুরের পশ্চিম ধারের মাঠ প্রকাণ্ড। সেখানে যখন পাল্কী এল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাখাল গোরু নিয়ে চলেচে গোষ্ঠে ফিরে। বিশ্বম্ভরবাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''ওহে বাপু, সপ্তগ্রাম কত দূরে বলতে পারো?"

রাখাল বললে, ''আজ্ঞে, সে তো সাত ক্রোশ হবে। আজ সেখানে যাবেন না। পথে ভীমহাটের মাঠ, তার কাছে শ্মশান। সেখানে ডাকাতের ভয়।"

ডাক্তার বললেন, ''বাবা, রোগী কষ্ট পাচ্ছে, আমাকে যেতেই হবে।" তিল্লুনি খালের ধারে যখন পাল্কী এল, রাত্রি তখন দশটা। বাঁধন আল্‌গা হয়ে পাল্কীর ছাদ থেকে ডাক্তারের বাক্সটা গেল পড়ে। ক্যাস্টর অয়েলের শিশি ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে গেল। বাক্সটা তো ফের শক্ত ক'রে বাঁধলে। কিন্তু আবার বিপদ। খাল পেরিয়ে আন্দাজ দু-ক্রোশ পথ গেছে এমন সময় মড়্ মড়্ ক'ড়ে ডাণ্ডা গেল ভেঙে, পাল্কীটা পড়ল মাটিতে। পাল্কী হালকা কাঠের তৈরী; বিশ্বম্ভরবাবুর দেহটি স্থূল।

আর উপায় নাই, এইখানেই রাত্রি কাটাতে হবে। ডাক্তারবাবু ঘাসের উপর কম্বল পাতলেন, লণ্ঠনটি রাখলেন কাছে। শম্ভুকে নিয়ে গল্প করতে লাগলেন।

এমন সময় বেহারাদের সর্দার বুদ্ধু এসে বললে, ''ঐ-যে কারা আসছে, ওরা ডাকাত সন্দেহ নেই।"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, ''ভয় কী, তোরা তো সবাই আছিস।"

বুদ্ধু বললে,"বল্লু পালিয়েছে,পল্লুকেও দেখছি নে। বক্সি লুকিয়েছে ঐ ঝোপের মধ্যে। ভয়ে বিষ্ণুর হাত-পা আড়ষ্ট।"

শুনে ডাক্তার ভয়ে কম্পিত। ডাকলেন,"শম্ভু!"

শম্ভু বললে, "আজ্ঞে!"

ডাক্তার বললেন, "এখন উপায় কী?"

শম্ভু বললে,"ভয় নেই, আমি আছি।"

ডাক্তার বললেন, "ওরা-যে পাঁচ জন।"

শম্ভু বললে, "আমি-যে শম্ভু।"

এই ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে একলম্ফ দিলে,গর্জন ক'রে বললে, "খবরদার!"

ডাকাতরা অট্টহাস্য ক'রে এগিয়ে আসতে লাগল।

তখন শম্ভু পাল্কীর সেই ভাঙা ডাণ্ডাখানা তুলে নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারলে। তারি এক ঘায়ে তিন জন একসঙ্গে প'ড়ে গেল। তার পরে শম্ভু লাঠি ঘুরিয়ে যেই ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাকি দুজনে দিল দৌড়।

তখন ডাক্তারবাবু ডাকলেন,"শম্ভু!"

শম্ভু বললে, "আজ্ঞে!"

বিশ্বম্ভরবাবু বললেন, "এইবার বাক্সটা বের করো।"

শম্ভু বললে, ‘‘কেন, বাক্স নিয়ে কী হবে?

ডাক্তার বললেন, ঐ তিনটে লোকের ডাক্তারী করা চাই। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে।”

রাত্রি তখন অল্পই বাকী। বিশ্বম্ভরবাবু আর শম্ভু দুজনে মিলে তিন জনের শুশ্রূষা করলেন।

সকাল হয়েছে। ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ফেটে পড়ছে। একে একে সব বেহারা ফিরে আসে। বল্তু এল, পল্টু এল, বক্সির হাত ধরে এল বিষ্ণু, তখনো তার হৃৎপিণ্ড কম্পমান।

ষ্টীমার আসিছে ঘাটে, প’ড়ে আসে বেলা,
পূজার ছুটির দল, লোকজন মেলা
এলো দূর দেশ হ’তে; বৎসরের পরে
ফিরে আসে যে-যাহার আপনার ঘরে।
জাহাজের ছাদে ভীড়; নানা লোকে নানা
মাদুরে কম্বলে লেপে পেতেচে বিছানা
ঠেসাঠেসি ক’রে। তারি মাঝে হরেরাম
মাথা নেড়ে বাজাইতেছে হারমোনিয়াম।
বোঝা আছে কত শত—— বাক্স কত রূপ
টিন বেত চামড়ার, পুঁটুলির স্তূপ,
থলি ঝুলি ক্যাম্বিশের, ডালা ঝুড়ি ধামা
সব্‌জিতে ভরা। গায়ে রেশমের জামা,
কোমরে চাদর বাঁধা, চণ্ডী অবিনাশ
কলিকাতা হ’তে আসে,বন্ধু শ্যামদাস
অম্বিকা অক্ষয়; নূতন চীনের জুতো
করে মস্‌মস্‌, মেরে কুনুয়ের গুঁতা

ভিড় ঠেলে আগে চলে—— হাতে বাঁধা ঘড়ি,
চোখেতে চশমা কারো, সরু এক ছড়ি
সবেগে দুলায়। ঘন ঘন ডাক ছাড়ে
ষ্টীমারের বাঁশি; কে পড়ে কাহার ঘাড়ে,
সবাই সবার আগে যেতে চায় চ'লে——
ঠেলাঠেলি, বকাবকি। শিশু মার কোলে
চীৎকারস্বরে কাঁদে। গড় গড় করে
নোঙর ডুবিল জলে; শিকলের ডোরে
জাহাজ পড়িল বাঁধা; সিঁড়ি গেল নেমে,
এঞ্জিনের ধকধকি সব গেল থেমে।
'কুলি' 'কুলি' ডাক পড়ে ডাঙা হ'তে মুটে
দুড়দাড় ক'রে এলো দলে দলে ছুটে।
তীরে বাজাইয়া হাঁড়ি গাহিছে ভজন
অন্ধ বেণী। যাত্রীদের আত্মীয় স্বজন।
অপেক্ষা করিয়া আছে; নাম ধ'রে ডাকে,
খুঁজে খুঁজে বের করে যে চায় যাহাকে।
চলিল গোরুর গাড়ি, চলে পালকী ডুলি,
শ্যাক্‌রা-গাড়ির ঘোড়া উড়াইল ধূলি।
সূর্য গেল অস্তাচলে; আঁধার ঘনালো;
হেথা হোথা কেরোসিন লণ্ঠনের আলো
দুলিতে দুলিতে যায়, তার পিছে পিছে
মাথায় বোঝাই নিয়ে মুটেরা চলিছে।
শূন্য হয়ে গেল তীর। আকাশের কোণে
পঞ্চমীর চাঁদ ওঠে। দূরে বাঁশবনে

শেয়াল উঠিল ডেকে। মুদির দোকানে

টিম্ টিম্ ক'রে দীপ জ্বলে একখানে।।

ত্রয়োদশ পাঠ

উদ্ধব মন্ডল জাতিতে সদ্গোপ। তার অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা। ভূসম্পত্তি যা কিছু ছিল ঋণের দায়ে বিক্রয় হয়ে গেছে। এখন মজুরী করে কায়ক্লেশে তার দিনপাত হয়।

এ দিকে তার কন্যা নিস্তারিনীর বিবাহ। বরের নাম বটকৃষ্ণ। তার অবস্থা মন্দ নয়। ক্ষেতের উৎপন্ন শস্য দিয়ে সহজেই সংসারনির্বাহ হয়। বাড়িতে পূজা-অর্চনা ক্রিয়াকর্মও আছে।

আগামী কাল উনিশে জ্যৈষ্ঠ বিবাহের দিন। বরযাত্রীর দল আসবে। তার জন্যে আহারাদির উদ্যোগ করা চাই। পাড়ার লোকে কিছু কিছু সাহায্য করেছে। অভাব তবু যথেষ্ট।

পাড়ার প্রান্তে একটি বড়ো পুষ্করিণী। তার নাম পদ্মপুকুর। বর্তমান ভূস্বামী দুর্লভবাবুর পূর্বপুরুষদের আমলে এই পুষ্করিণী সর্বসাধারণ ব্যবহার করতে পেতো। এমন কি গ্রামের গৃহস্থবাড়ির কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রয়োজনউপস্থিত হ'লে মাছ ধ'রে নেবার বাধা ছিল কিন্তু সম্প্রতি দুর্লভবাবু সেই অধিকার বন্ধ ক'রে দিয়েছেন। অল্প কিছু দিন আগে খাজনা দিয়ে বৃন্দাবন জেলে তাঁর কাছ থেকে এই পুকুরে মাছ ধরবার স্বত্ব পেয়েছে।

উদ্ধব এ সংবাদ ঠিকমত জানতো না। তাই সেদিন রাত্রি থাকতে উঠে পদ্মপুকুর থেকে একটা বড়ো দেখে রুইমাছ ধ'রে বাড়ি আনবার উপক্রম করছে। এমন সময় বিঘ্ন ঘটলো।

সেদিন দুর্লভবাবুর ছোটো কন্যার অন্নপ্রাশন। খুব সমারোহ ক'রে লোক খাওয়ানো হবে। তারি মাছ-সংগ্রহের জন্য বাবুর কর্মচারী কৃত্তিবাস কয়েক জন জেলে নিয়ে সেই পুষ্করিণীর ধারে এসে উপস্থিত।

দেখে, উদ্ধব এক মস্ত রুই মাছ ধরেছে। সেটা তখনি তার কাছ থেকে কেড়ে নিলে। উদ্ধব কৃত্তিবাসের হাতে পায়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলো। কোনো ফল হ'লো না।ধনঞ্জয় পেয়াদা তাকে বলপূর্বক ধ'রে নিয়ে গেলদুর্লভবাবুর কাছে।

দুর্লভের বিশ্বাস ছিল, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অত্যাচারী ব'লে উদ্ধব তাঁর দুর্নাম করেছে। তাই তার উপরে তাঁর বিষম ক্রোধ। বললেন, ''তুই মাছ চুরি করেছিস, তার দন্ড দিতে হবে।"

ধনঞ্জয়কে বললেন, ''একে ধরে নিয়ে যাও। যতক্ষণ না দশ টাকা দন্ড আদায় হবে, ছেড়ে দিয়ো না।"

উদ্ধব হাতজোড় ক'রে বললে, ''আমার দশ পয়সাও নেই। কাল কন্যার বিবাহ। কাজ শেষ হয়ে যাক, তার পরে আমাকে শাস্তি দেবেন।"

দুর্লভবাবু তার কাতর বাক্যে কর্ণপাত করলেন না। ধনঞ্জয় উদ্ধবকে সকল লোকের সম্মুখে অপমান ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল।

দুর্লভের পিসি কাত্যায়নী ঠাকরুন সেদিন অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে অন্তঃপুরে উপস্থিত ছিলেন। উদ্ধবের স্ত্রী মোক্ষদা তাঁর কাছে কেঁদে এসে পড়লো।

কাত্যায়নী দুর্লভকে ডেকে বললেন, ''বাবা, নিষ্ঠুর হ'য়ো না। উদ্ধবের কন্যার বিবাহে যদি অন্যায় করো তবে তোমার কন্যার অন্নপ্রাশনে অকল্যাণ হবে। উদ্ধবকে মুক্তি দাও।"

দুর্লভ পিসির অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে চ'লে গেলেন। কৃত্তিবাসকে ডেকে কাত্যায়নী বললেন, ''উদ্ধবের দন্ডের এই দশ টাকা দিলাম। এখনি তাকে ছেড়ে দাও।"

উদ্ধব ছাড়া পেলে। কিন্তু অপমানে লজ্জায় তার দুই চক্ষু দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

পরদিন গোধূলিলগ্নে নিস্তারিণীর বিবাহ। বেলা যখন চারটে, তখন, পাঁচজন বাহক উদ্ধবের কুটীর প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত। কেউ বা এনেছে ঝুড়িতে মাছ, কেউ বা এনেছে হাঁড়িতে দই, কারও হাতে থালায় ভরা সন্দেশ, একজন এনেছে একখানি লাল চেলির শাড়ি।

পাড়ার লোকের আশ্চর্য লাগল। জিজ্ঞাসা করলে, ''কে পাঠালেন?'' বাহকেরা তার কোনো উত্তর না ক'রে চ'লে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই কুটীরের সম্মুখে এক পাল্কী এসে দাঁড়ালো। তার মধ্যে থেকে নেমে এলেন কাত্যায়নী ঠাকরুন। উদ্ধব এত সৌভাগ্যস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতো না। কাত্যায়নী বললেন, ''দুর্লভ কাল তোমাকে অপমান করেছে, সে কথা তুমি মনে রেখো না। আমি তোমার কন্যাকে আশীর্বাদ ক'রে যাবো, তাকে ডেকে দাও।"

কাত্যায়নী নিস্তারিণীকে একগাছি সোনার হার পরিয়ে দিলেন। আর তার হাতে এক শত টাকার একখানি নোট দিয়ে বললেন, ‘‘এই তোমার যৌতুক।’’

অঞ্জনা নদীতীরে চন্দনী গাঁয়ে
পোড়ো মন্দিরখানা গঞ্জের বাঁয়ে
জীর্ণ ফাটল-ধরা—— এক কোণে তারি
অন্ধ নিয়েছে বাসা কুঞ্জবিহারী।
আত্মীয় কেহ নাই নিকট কি দূর,
আছে এক ল্যাজ-কাটা ভক্ত কুকুর।
আর আছে একতারা, বক্ষেতে ধ’রে
গুন্ গুন্ গান গায় গুঞ্জন-স্বরে।
গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন
দু-মুঠো অন্ন তারে দুই বেলা দেন।
সাতকড়ি ভঞ্জের মস্ত দালান,
কুঞ্জ সেখানে করে প্রত্যূষে গান।
‘‘হরি হরি’’ রব উঠে অঙ্গনমাঝে,
ঝনঝনি ঝনঝনি খঞ্জনী বাজে।
ভঞ্জের পিসি তাই সন্তোষ পান,
কুঞ্জকে করেছেন কম্বল দান।
চিঁড়ে মুড়কিতে তার ভরি দেন ঝুলি,
পৌষে খাওয়ান ডেকে মিঠে পিঠে-পুলি।
আশ্বিনে হাট বসে ভারী ধূম ক’রে,
মহাজনী নৌকায় ঘাট যায় ভ’রে——

হাঁকাহাঁকি ঠেলাঠেলি মহা সোরগোল,

পশ্চিমী মাল্লারা বাজায় মাদোল।

বোঝা নিয়ে মন্থর চলে গোরুগাড়ি,

চাকাগুলো ক্রন্দন করে ডাক ছাড়ি।

কল্লোলে কোলাহলে জাগে একধ্বনি

অন্ধের কণ্ঠের গান আগমনী।

সেই গান মিলে যায় দূর হতে দূরে

শরতের আকাশেতে সোনা রোদ্দুরে।।